بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৫ ডিসেম্বর, ২০২০ মোতাবেক ২৫ ফাতাহ্, ১৩৯৯ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

গত খুতবায় হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাত এবং বিদ্রোহীদের বিষয়ে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে হযরত আলীর চেষ্টা-প্রচেষ্টা কিংবা (আলোচনার ধারাবাহিকতায়) এরপর হযরত আলী (রা.)'র যেসব ঘটনা আসবে, এ সম্পর্কে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন,

"যেহেতু তোমরাও সাহাবীদের সাথে সামঞ্জস্য রাখ তাই আমি ইতিহাস থেকে বর্ণনা করতে চাই যে কীভাবে মুসলমানরা ধ্বংস হয়েছে আর তাদের ধ্বংসের কারণগুলো কী-কী। অতএব তোমরা সাবধান হয়ে যাও আর তোমাদের নবাগতদের জন্য তালীম বা শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করো। অর্থাৎ সঠিক তরবিয়ত হওয়া চাই, তাদের ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া চাই। হযরত উসমান (রা.)-এর সময় যে নৈরাজ্য মাথা চাড়া দিয়েছিল, তা সাহাবীদের পক্ষ থেকে উদ্ভূত নয়। যারা বলে যে, সাহাবারা এই নৈরাজ্যের হোতা ছিলেন, তারা মূলত ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, হযরত আলী (রা.)-এর বিরোধীতায় অনেক সাহাবী দণ্ডায়মান হয়েছিলেন, মুয়াবীয়া (রা.)-এর ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছিল কিন্তু আমি বলছি যে, এই নৈরাজ্যের হোতা সাহাবীরা ছিলেন না বরং তারাই ছিল– যারা পরবর্তীতে এসেছে আর যারা মহানবী (সা.)-এর সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য পায় নি এবং তাঁর সাহচর্যে বসারও সুযোগ হয় নি। অতএব আমি আপনাদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করছি আর নৈরাজ্য থেকে নিরাপদ থাকার যে পদ্ধতি বলছি তা হল, অধিকহারে কাদিয়ান আসুন (তখন তিনি কাদিয়ানে ছিলেন) এবং বারবার আসুন, যেন আপনাদের ঈমান সতেজ থাকে এবং আপনাদের আল্লাহ্ভীতি যেন বৃদ্ধি পেতে থাকে। অর্থাৎ আপনাদের কেন্দ্রের সাথেও সম্পর্ক থাকতে হবে এবং খেলাফতের সাথেও সম্পর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। এগুলো থাকলে তরবিয়ত বা শিক্ষাদীক্ষার মান ও সঠিক থাকবে।"

বর্তমানে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এমটিএ'র কল্যাণে ধন্য করেছেন। খুতবা সমগ্র পৃথিবীতে শোনা যায় দেখানো হয়, শোনানো হয় এছাড়া অন্যান্য অনুষ্ঠানমালা দেখানো হয় আর শোনানোও হয়। তাই তরবিয়তের জন্য আবশ্যকীয় বিষয় হলো, আপনি স্বয়ং হযরত মসীহে মাওউদ (আ.)-এর বইপুস্তক অধ্যায়নের পাশাপাশি এমটিএ'র সাথেও সম্পর্ক রাখুন আর বিশেষভাবে জুমুআর খুতবা অবশ্যই এমটিএ'র মাধ্যমে শুনুন। যেন খেলাফতের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত থাকে, দৃঢ়তর হয় বরং বৃদ্ধি পেতে থাকে।

উষ্ট্রীর যুদ্ধের ঘটনা সম্পর্কে রেওয়ায়েতে এসেছে যে, উষ্ট্রীর যুদ্ধ হযরত আলী (রা.) এবং হযরত আয়েশা (রা.)'র মাঝে ৩৬ হিজরী সনে সংঘটিত হয়েছিল। হযরত আয়েশা (রা.)'র সাথে হযরত তালহা এবং হযরত যুবায়েরও ছিলেন। হযরত আয়েশা (রা.) উক্ত যুদ্ধের ময়দানে একটি উটে আরোহীত ছিলেন তাই সেই যুদ্ধের নাম উষ্ট্রীর যুদ্ধ হিসেবে প্রসিদ্ধ। হযরত আয়েশা (রা.) হজ্জ করার উদ্দেশ্যে মক্কা গিয়েছিলেন। তিনি সেখানেই অবস্থান কালেই হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের সংবাদ পান। উমরা আদায় শেষে তিনি যখন মদীনার দিকে যাত্রা করেন তখন পথিমধ্যে সারফ্ নামক জায়গায় উবায়েদ বিন আবু সালামা

সংবাদ দেন যে, হযরত উসমান (রা.)কে শহীদ করে দেয়া হয়েছে এবং হযরত আলী (রা.) খলিফা নির্বাচিত হয়েছেন। মদীনা মুনাওয়ারায় নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি বিরাজমান। অতএব হযরত আয়েশা (রা.) সেখান থেকেই মক্কায় ফেরত যান এবং হযরত উসমান (রা.)-এর রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ এবং নৈরাজ্যের অবসান কল্পে লোকদের সমবেত করেন। হযরত আয়েশা, হযরত তালহা এবং হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.)-এর নেতৃত্বে অনেকেই সমবেত হয় আর এই কাফেলা সেখান থেকে বসরা অভিমুখে যাত্রা করে। হযরত আলী (রা.)ও বসরার দিকে যাত্রা করেন এটি দেখে যে, কাফেলা সেদিকেই যাচ্ছে। বসরা পৌঁছে হযরত আয়েশা (রা.) নগরবাসীকে তার দলে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রন জানান। নগরবাসীর একটি বড় সংখ্যা হযরত আয়েশা (রা.)'র দলে যোগ দেয় কিন্তু একটি জামা'ত হযরত আলী (রা.)'র নিযুক্ত বসরার গভর্ণর উসমান বিন হুনায়ফ এর হাতে বয়আত করে। উভয় জামাতের মাঝে তখন হাতাহাতি হয়। হযরত আলীর বাহিনীও সেখানে পৌঁছে যায় এবং হযরত আলী (রা.) হযরত আয়েশা (রা.)'র ঘাটির পাশেই তাবু স্থাপন করেন। উভয় পক্ষ থেকে মীমাংসার চেষ্টা হয় আর আলোচনা আরম্ভ হয় কিন্তু রাতের বেলা সেই দল যারা হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যায় জড়িত ছিল তাদের একটি অংশ হযরত আলী (রা.)'র বাহিনীতেও ছিল, তারা হযরত আয়েশা (রা.)'র বাহিনীর ওপর আক্রমন করে বসে যার ফলে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। হযরত আয়েশা (রা.) উটে আরোহিত ছিলেন। জানবাজরা একে একে উটের লাগাম ধরে শহিদ হতে থাকে। হযরত আলী (রা.) বুঝতে পেরেছিলেন যে, হযরত আয়েশা (রা.) যতক্ষন উটে আরোহিত থাকবেন ততক্ষণ যুদ্ধ শেষ হবে না। তাই তিনি যোদ্ধাদের নির্দেশ দেন এই উটকে কোন না কোনভাবে ধরাসায়ী কর কেননা এটিকে ধরাসায়ী করলেই যুদ্ধ বন্ধ হবে। তখন এক ব্যক্তি এগিয়ে গিয়ে উটের পায়ে তরবারির আঘাত হানে ফলে সেই উট মাটিতে ছটফট করতে করতে বসে যায়। হযরত আলীর বাহিনী উক্ত উটকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে। হযরত আয়েশা (রা.)'র উট পড়ে যাওয়ার পর তাঁর যোদ্ধারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। তারপর হযরত আলী (রা.) ঘোষণা দেন যে, যারা অস্ত্র সমর্পন করবে এবং যারা ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থাকবে তারা নিরাপদ থাকবে। (নিজ সৈন্যদেরকে নির্দেশনা দিয়ে বলেন) কারো যেন পিছুধাওয়া করা না হয়, কারো সম্পদকে গনিমতের মাল মনে করে তা যেন হস্তগত করা না হয়। হযরত আলীর সৈন্যবাহিনী সেই নির্দেশ পালন করে। হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.) এবং হযরত তালহা (রা.) এই যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। এই অংশটা ইবনে আসিরের ইতিহাস থেকে নেওয়া হয়েছে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এ সম্পর্কে বলেন, যারা হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যার সাথে জড়িত ছিল তাদের একটি দল হযরত আয়েশা (রা.)কে হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার নামে জেহাদের ঘোষণা দিতে সম্মত করে। তদনুসারে তিনি এই যুদ্ধের ঘোষণা দেন এবং সাহাবীদেরকে নিজ সাহায্যার্থে আহবান জানান। হযরত তাল্হা এবং হযরত যুবায়েরও তার সাথে যোগ দেন আর এর ফলে হযরত আয়েশা, হযরত তালহা ও হযরত যুবায়ের বাহিনীর সাথে হযরত আলীর সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অর্থাৎ হযরত তালহা এবং হযরত যুবায়ের হযরত আয়েশা (রা.)-এর সৈন্যবাহিনীতে ছিলেন। এভাবে হযরত আলী (রা.) এবং হযরত আয়েশা (রা.)-বাহিনীর মাঝে সংঘটিত এ যুদ্ধকে'জঙ্গে জামাল' (অর্থাৎ উষ্ট্রীর যুদ্ধ) বলা হয়, সেই যুদ্ধের শুরুতেই হযরত যুবায়ের (রা.) হযরত আলী (রা.)-র মুখে নবী করীম (সা.)-এর একটি ভবিষ্যদ্বাণী শুনে পৃথক হয়ে গেলেন এবং তিনি শপথ করলেন যে, তিনি হযরত আলীর সাথে যুদ্ধ করবেন না আর এই কথা স্বীকার করলেন যে, তিনি ব্যাখ্যায় ভুল করেছেন। অপরদিকে হযরত তালহা (রা.)ও তার মৃত্যুর পূর্বে হযরত আলী (রা.)'র হাতে বয়াতের অঙ্গীকার করেন। ইতিপূর্বে গত খুতবায় এর উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা রেওয়ায়াতসমূহে এসেছে যে, তিনি আহত অবস্থায় যন্ত্রনার আতিসয্যে ছটফট

করছিলেন, সে সময় এক ব্যক্তি তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তিনি সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোন দলের সাথে সম্পর্ক রাখ? সেই ব্যক্তি বললো, হযরত আলীর দলের সাথে। তখন তিনি নিজ হাত তার হাতে রেখে বললেন যে, 'তোমার হাত আলীর হাত, আর আমি তোমার হাতে হাত রেখে পুনরায় হযরত আলীর বয়াত করছি। মোটকথা জামালের যুদ্ধের সময়েই অবশিষ্ট সাহাবীদের মতবিরোধের সমাধান হয়ে যায় কিন্তু হযরত মুয়াবিয়ার মতবিরোধ সিফ্‌ফিনের যুদ্ধ পর্যন্ত চলতে থাকে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) আরো বলেন,

হযরত উসমানের হন্তারক দল বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং নিজেদেরকে অপবাদমুক্ত করার জন্য অন্যদের ওপর অপবাদ আরোপ করছিল। যখন তারা বুঝতে পারল, হযরত আলী মুসলমানদের বয়আত নিয়েছেন তখন তারা তার প্রতি অপবাদ আরোপের উৎকৃষ্ট সুযোগ পেয়ে গেল। যদিও প্রকৃত ঘটনা এমনই ছিল অথাৎ হযরত উসমানের হত্যাকারীদের মাঝে কতিপয় ব্যক্তি তাঁর (হযরত আলীর) চতুর্পার্শ্বে সমবেত হয়ে গিয়েছিল তাই অপবাদ আরোপের উত্তম সুযোগ তাদের হাতে এসে গেল। যেমন তাদের মধ্য থেকে যে দলটি মক্কার দিকে গিয়েছিল তারা হযরত আয়েশাকে এ বিষয়ে সম্মত করে যে তিনি যেন হযরত উসমানের হত্যার প্রতিশোধের জন্য জেহাদের ঘোষণা দেন। সুতরাং তিনি এ কথার ঘোষণা দেন এবং সাহাবাদেরকে নিজেদের সহযোগিতার জন্য আহ্বান জানালেন। হযরত তালহা ও যুবায়ের হযরত আলীর বয়আত এ শর্তে করেছিলেন যে, যতশীঘ্র সম্ভব তিনি হযরত উসমানের হত্যাকারীদের প্রতিশোধ নিবেন। তারা শীঘ্র প্রতিশোধের যে অর্থ বুঝতেন তা হযরত আলীর দৃষ্টিতে স্থানকাল অনুপযোগী ছিল। হযরত আলীর ধারণা ছিল, সকল প্রদেশে শান্তিশৃখলা বহাল হওয়ার পর হত্যাকারীদের শাস্তি দেয়ার প্রতি মনোযোগ দেয়া যাবে। কেননা ইসলামের সুরক্ষা সবকিছুর ওপর অগ্রগণ্য, হত্যাকারীদের (শাস্তির) বিষয়টি বিলম্বিত হলেও কোন সমস্যা নাই। অনুরুপভাবে হত্যাকারীদের চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে মতানৈক্য ছিল। যেসব লোক নিতান্ত বিমর্ষ চেহারা নিয়ে হযরত আলীর কাছে পৌছে গিয়েছিল এবং ইসলামে দলাদলির আশঙ্কা প্রকাশ করছিল তাদের ব্যাপারে হযরত আলী স্বভাবগতভাবেই সন্দেহ করতে পারেন নি যে, এসব লোকই বিশৃংখলার হোতা। অন্যরা এদের সন্দেহ করতো অর্থাৎ হযরত আলীর তাদের প্রতি কোন সন্দেহ ছিল না, কিন্তু অন্যরা তাদের সন্দেহ করত। এ মতপার্থক্যের কারণে তালহা ও যুবায়ের মনে করলেন, হযরত আলী তার অঙ্গীকার থেকে সরে যাচ্ছেন। কেননা তারা এক শর্তে বয়আত নিয়েছিলেন এবং তাদের মতে সেই শর্ত হযরত আলী পূর্ণ করেন নি, এ কারণে তারা শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেদেরকে বয়আত থেকে মুক্ত মনে করতেন। যখন হযরত আয়েশার ঘোষনা তাদের কাছে পৌঁছল তখন তারাও তাদের সাথে মিলিত হলেন এবং সবাই মিলে বসরার দিকে চলে গেলেন। কিন্তু বসরার গভর্নর লোকদেরকে তাদের সাথে মিলিত হওয়া থেকে বিরত রাখে, কিন্তু যখন মানুষ জানতে পারল যে, তালহা এবং যুবায়ের কেবলমাত্র বাধ্য হয়ে এবং একটি শর্ত দিয়ে হযরত আলীর হাতে বয়আত করেছেন, তখন অধিকাংশ লোক তাদের সাথে মিলিত হল। যখন হযরত আলী সেই বাহিনীর সংবাদ পেলেন, তখন তিনিও একটি সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করলেন এবং বসরার দিকে রওনা হলেন। বসরা পৌছে তিনি এক লোককে হযরত আয়েশা, তালহা ও যুবায়েরের কাছে প্রেরণ করলেন। সেই লোক প্রথমে হযরত আয়েশার সমীপে উপস্থিত হল এবং জিজ্ঞেস করল, আপনার অভিপ্রায় কী? তিনি জবাব দিলেন, আমাদের অভিপ্রায় কেবল মাত্র পরিশুদ্ধ করা। এরপর সেই ব্যক্তি তালহা ও যুবায়েরকে ডাকল এবং জিজ্ঞেস করল, আপনারাও একই কারণে যুদ্ধের জন্য রাজি হয়েছেন? তারা বললেন, হ্যাঁ অর্থাৎ, সংশোধনের উদ্দেশ্যে। সেই ব্যক্তি জবাব দিল, যদি আপনাদের ইচ্ছা এটি হয় তাহলে এর পদ্ধতি এটি নয় যা আপনারা অবলম্বন করেছেন। এর পরিণাম তো

বিশৃংখলা। এ সময় দেশের অবস্থা এমন যে, যদি এক ব্যক্তিকে আপনারা হত্যা করেন তবে হাজার হাজার লোক তার সমর্থনে দণ্ডায়মান হবে এবং তাদের মোকাবিলা করবে, আরো বহু লোক তাদের সাহায্যের জন্য দণ্ডায়মান হবে। অতএব এই ধারা চলতেই থাকবে। তাই সমাধান হল, প্রথমে দেশকে ঐক্যের রজ্জুতে বাঁধা হোক, এরপর দুষ্কৃতকারীদের শাস্তি দিলে চলবে। নতুবা এমন নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিতে কাউকে শাস্তি দেয়া দেশে আরো অধিক অরাজকতা সৃষ্টির নামান্তর। শাষণব্যবস্থা আগে দৃঢ় হোক তখন তারা শাস্তি দিবে। এটি শুনে তারা বলে, যদি হযরত আলীর মতামতও এটিই হয় তাহলে তিনি যেন আসেন। আমরা তার সাথে সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত আছি। তখন সেই ব্যক্তি হযরত আলীকে এটি অবগত করল এবং দুই দলের প্রতিনিধিরা একজন আরেকজনের সাথে সাক্ষাত করে সিদ্ধান্ত নিলেন, যুদ্ধ করা ঠিক হবে না সন্ধি হওয়া উচিত। এ সংবাদ যখন আব্দুল্লাহ বিন সাবার লোকদের নিকট তথা হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকারী সাবাঈদের নিকট পৌঁছল তখন তারা খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ে এবং গোপনে তাদের এক দল শলা-পরামর্শের জন্য সমবেত হয়। তারা পরামর্শ শেষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে, মুসলমানদের মাঝে সন্ধি হওয়া আমাদের জন্য খুবই ক্ষতিকর সাব্যস্ত হবে কেননা, মুসলমানরা যতক্ষণ পারস্পরিক বিবাদে লিপ্ত থাকবে ততক্ষণ আমরা হযরত উসমানের হত্যার শাস্তি এড়াতে পারবো। যদি সন্ধি হয়ে যায় আর শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়ে যায় তাহলে আমাদের কোন ঠাঁই থাকবে না কোথাও মাথা গোঁজার ঠাই পাব না। এজন্য যেভাবেই হোক না কেন সন্ধি হতে দেয়া যাবে না। ইতিমধ্যে হযরত আলী (রা.)-ও এসে পৌঁছেন আর তাঁর পৌঁছার পরদিন সেখানে তাঁর ও হযরত যুবায়েরের সাক্ষাত হয়। সাক্ষাৎকালে হযরত আলী (রা.) বলেন, আমার সাথে যুদ্ধের জন্য তো আপনি সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করেছেন কিন্তু খোদার দরবারে উপস্থাপনের জন্য কোন ওজর বা অজুহাতও কি প্রস্তুত করেছেন? আপনারা কেন নিজ হাতে সেই ইসলামকে ধ্বংস করতে উদ্দত যার সেবা প্রানান্তকর পরিশ্রম করে করেছিলেন? আমি কি আপনাদের ভাই নই? তাহলে এখন কী হলো! প্রথমে পরস্পরকে হত্যা করা হারাম জ্ঞান করা হতো কিন্তু এখন তা হালাল হয়ে গেল! নতুন কোন বিষয়ের সূচনা হলে তবুও কথা ছিল কিন্তু যখন নতুন কোন বিষয় সৃষ্টিই হয় নি তাহলে কেন এই যুদ্ধ? এতে হযরত তালহা (রা.) যিনি হযরত যুবায়েরের সাথে ছিলেন তিনি বলেন আপনি হযরত উসমানকে হত্যার জন্য মানুষকে প্ররোচিত করেছেন। হযরত আলী বলেন, আমি হযরত উসমানের হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের অভিসম্পাত করি। এরপর হযরত আলী (রা.) হযরত যুবায়ের (রা.)-কে বলেন, তোমার কি মনে নেই, মহানবী (সা.) বলেছিলেন, আল্লাহর কসম তুমি আলীর সাথে যুদ্ধ করবে আর তুমি যালেম বা অন্যায়ে ওপর থাকবে। অর্থাৎ হযরত যুবায়ের (রা.)-কে মহানবী (সা.) বলেছিলেন। একথা শুনে হযরত যুবায়ের নিজ সৈন্যবাহিনীর দিকে ফিরে যান এবং কসম খান যে, তিনি হযরত আলীর সাথে কোনক্রমেই যুদ্ধ করবেন না আর স্বীকার করেন যে, তিনি বুঝতে ভুল করেছিলেন। এ সংবাদ যখন সৈন্যবাহিনীর মাঝে ছড়িয়ে পড়ে তখন সবাই আশ্বস্ত হয় যে, এখন আর যুদ্ধ হবে না, সন্ধি বা মীমাংসা হয়ে যাবে। কিন্তু নৈরাজ্যবাদীরা কঠিন দুশ্চিন্তায় পড়ে। যাদের অভিপ্রায় ছিল নৈরাজ্য সৃষ্টির, স্বাভাবিক ভাবেই তারা আতঙ্কিত হওয়ার ছিল আর তাই তারা ভয় পেতে থাকে। রাত নেমে আসলে তারা সন্ধিকে নস্যাৎ করার জন্য যে ষড়যন্ত্র করেছে তা হলো, তাদের মধ্য থেকে যারা হযরত আলীর সাথে ছিল তারা হযরত আয়েশা, হযরত তালহা এবং হযরত যুবায়েরের সৈন্যবাহিনীতে হামলা করে দেয় পক্ষান্তরে তাদের সৈন্যবাহিনীতে যারা ছিল তারা হযরত আলীর সৈন্যবাহিনীতে রাতের বেলা আক্রমণ করে বসে। মুনাফিকরা উভয় দলে অর্থাৎ হযরত আয়েশার ও হযরত আলীর দলেও বিভক্ত হয়ে অর্ন্তভুক্ত হয়ে ছিল। উভয়ে একে অপরের উপর হামলা করে বসে অর্থাৎ বিরোধী দলের উপর আক্রমণ করেছে নিজেদের মাঝে যুদ্ধ করে নি।

এরফলে, চারিদিকে হৈচৈ শুরু হয়ে যায় আর প্রত্যেক দলই মনে করে, অপর পক্ষ ধোকা দিয়েছে অথচ এটি কেবল সাবাঈদের একটি ষড়যন্ত্র ছিল। যুদ্ধ যখন শুরু হয়ে যায় তখন হযরত আলী (রা.) চিৎকার করে বলেন যে, কেউ গিয়ে হয়রত আয়েশাকে সংবাদ দিক, হতে পারে তার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা এই নৈরাজ্যের অবসান ঘটাবেন। অতঃপর হযরত আয়েশার উট সম্মুখে নিয়ে আসা হয় কিন্তু পরিণাম আরো ভয়াবহ হয়। নৈরাজ্যবাদীরা যখন দেখল যে, তাদের ষড়যন্ত্রের ফলাফল উল্টো প্রকাশ পাচ্ছে তখন তারা হযরত আয়েশা (রা.)-এর উটকে লক্ষ্য করে তির নিক্ষেপ করা আরম্ভ করে। হযরত আয়েশা (রা.) উচ্চস্বরে লোকদেরকে আহ্ববান করে বলা আরম্ভ করলেন যে, হে লোকসকল যুদ্ধ পরিত্যাগ কর এবং আল্লাহ ও বিচারদিবসকে স্মরণ কর। কিন্তু নৈরাজ্যবাদীরা বিরত হল না বরং অব্যহতভাবে তাঁর উট লক্ষ্য করে তির নিক্ষেপ করতে থাকে। যেহেতু বসরাবাসীরাও হযরত আয়েশা (রা.)-এর চতুর্পার্শ্বে সমবেত সৈন্যবাহিনীর সাথে ছিল তারা এটি দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়ে আর উম্মুল মোমেনীনের এ অবমাননা দেখে তাদের ক্রোধের আর সীমা রইল না, তারা তরবারি বের করে বিপক্ষ সৈন্যবাহিনীর ওপর হামলে পড়ে ফলে তখন হযরত আয়েশার উটই যুদ্ধের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। সাহাবিগন এবং বড় বড় বীর তার চারপাশে সমবেত হয়ে যায়; একের পর এক তারা নিহত হতে থাকেন কিন্তু তারা উটের লাগাম ছাড়েনি। হযরত যুবায়ের যুদ্ধে অংশই নেন নি এবং কোন এক দিকে বেরিয়ে যান। একজন হতভাগা তাঁর নামাযরত অবস্থায় পেছন দিক থেকে এসে তাকে শহীদ করে। হযরত তালহা একান্ত যুদ্ধের ময়দানেই এসব দুষ্কৃতকারীদের হাতে নিহত হন। যুদ্ধ যখন তুমূল রূপ ধারণ করে; এটি অনুভব করে যে হযরত আয়েশা (রা.) কে যতক্ষন পর্যন্ত না যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরানো হবে ততক্ষন এই যুদ্ধ শেষ হবে না– কিছু মানুষ তাঁর উটের পা কেটে দেয় এবং হাওদা নামিয়ে মাটিতে রেখে দেয়; তখন যুদ্ধ শেষ হয়। এ ঘটনা দেখে হযরত আলী (রা.)-এর চেহারা দুঃখের আতিসয্যে রক্তিমবর্ণ ধারণ করে, তবে যা-ই ঘটেছে তা এড়ানোরও কোন কোন উপায় ছিল না। যুদ্ধ শেষে যখন মৃতদের মাঝে হযরত তালহার মৃতদেহ উদ্ধার হলো হযরত আলী (রা.) গভীর অনুশোচনা ব্যাক্ত করেন। এই সমস্ত ঘটনাবলী থেকে এটি স্পষ্টভাবে প্রতিভাত যে, এই যুদ্ধে সাহাবীদের কোন প্রকার ভূমিকা ছিল না বরং এই দুঃষ্কার্য হযরত উসমান (রা.)-এর ঘাতকদেরই রচিত ছিল। সত্য কথা হলো তালহা এবং যুবায়ের হযরত আলী (রা.)-এর হাতে বয়াত করেই মারা গিয়েছেন কেননা তারা নিজের ইচ্ছা ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং হযরত আলীর সঙ্গ দেয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন। কিন্তু কতিপয় কুচক্রিদের হাতে নিহত হয়েছেন। এরপর হযরত আলী (রা.) তাদের হত্যাকারীদের প্রতি অভিসম্পাতও করেছেন। উষ্ট্রীর যুদ্ধ শেষে হযরত আলী (রা.) হযরত আয়েশা (রা.)-এর জন্য সমস্ত বাহন এবং পাথেয় প্রস্তুত করেন এবং হযরত আয়েশাকে বিদায় দেয়ার জন্য স্বয়ং উপস্থিত হন। হযরত আয়েশার সফরসঙ্গী হিসেবে যাদের যাওয়ার ছিল তাদের রওয়ানা করান। এমনকি হযরত আয়েশা (রা.)-এর যাত্রার দিন হযরত আলী (রা.) স্বয়ং হযরত আয়েশার কাছে যান এবং তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যান। হযরত আয়েশা (রা.) সবার উপস্থিতিতে মানুষের সামনে বের হন এবং বলেন, হে আমার সন্তানেরা! আমরা পরস্পরকে কষ্ট দিয়ে এবং বাড়াবাড়ি করে একে অপরকে অসন্তুষ্ট করেছি। ভবিষ্যতে আমাদের এসব মতবিরোধের কারণে কেউ কারো প্রতি যেন অন্যায়-অবিচার না করে। খোদা তা'লার কসম! আমার এবং হযরত আলী (রা.)-এর মধ্যে শুরু থেকেই কোন ধরনের মতবিরোধ ছিল না; তবে পুরুষ ও তার শশুরবাড়ির আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে সচরাচর ছোটখাট যেসব বিষয় ঘটে থাকে সেগুলো ব্যতিত। আর হযরত আলী (রা.) আমার পুণ্য অর্জনের মাধ্যমস্বরূপ। হযরত আলী (রা.) বলেন, হে লোকসকল! হযরত আয়েশা (রা.) উত্তম ও সত্য কথা বলেছেন। আমার ও হযরত আয়েশার মাঝে কেবল এতটুকুই বিরোধ

ছিল। হযরত আয়েশা (রা.) ইহ ও পরকালে তোমাদের সম্মানিত নবী (সা.)-এর পবিত্র সহধর্মিনী। হযরত আলী (রা.) হযরত আয়েশা (রা.)-কে বিদায় জানানোর উদ্দেশ্যে বেশ কয়েক মাইল তাঁর সাথে যান এবং হযরত আলী (রা.) তাঁর পুত্রদের আদেশ দেন, তারা যেন হযরত আয়েশা (রা.)-এর সাথে যান এবং একদিন পর ফিরে আসেন। উল্লিখিত উদ্ধৃতিটি তাবরী থেকে নয়। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে,

হযরত তালহা মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের পরও জীবিত ছিলেন। হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের পর মুসলমানদের মাঝে যখন মতবিরোধ দেখা দেয় এবং এক দল বলে যে, আমাদের উচিত হযরত উসমান (রা.)-এর ঘাতকদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা। সেই দলের নেতা ছিলেন হযরত তালহা, হযরত যুবায়ের ও হযরত আয়েশা (রা.)। অপরদিকে অন্য দল বলে– মুসলমানদের মাঝে ভেদাভেদ অনেক বেড়ে গেছে, মানুষ তো মারা গিয়েই থাকে তাই আমাদেরকে এক্ষুনি সকল মুসলমানদের সমবেত করা উচিত যেন ইসলামের প্রতাপ ও মাহত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা পরবর্তীতে এদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করব; এই দলের নেতা ছিলেন হযরত আলী (রা.)। এই বিরোধ এতটাই বৃদ্ধি পেল যে, হযরত তালহা, হযরত যুবায়ের এবং হযরত আয়েশা (রা.) এই অভিযোগ উত্থাপন করেন যে– হযরত আলী (রা.) হযরত উসমান (রা.)-কে যারা শহীদ করেছে তাদের আশ্রয় দিতে চায়। অপরদিকে হযরত আলী (রা.) এই অভিযোগ করেন যে– যারা বলে, তাৎক্ষণিক প্রতিশোধ নেয়া উচিত; এদের কাছে ব্যক্তিস্বার্থই মুখ্য, ইসলামের স্বার্থ নয়। বস্তুত মতবিরোধ চরম আকার ধারণ করেছিল; আর এরপর পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধও আরম্ভ হয়ে যায়, এমন যুদ্ধ যেখানে হযরত আয়েশা সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব দেন। তিনি উটে চড়ে নিজে যুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং হযরত তালহা ও হযরত যুবায়েরও এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যখন উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ চলছিল, তখন একজন সাহাবী হযরত তালহার কাছে আসেন এবং তাকে বলেন, তালহা, তোমার মনে আছে, অমুক দিন তুমি ও আমি রসূলে করীম (সা.)-এর সভায় বসে ছিলাম; রসূলে করীম (সা.) তখন বলেছিলেন, তালহা, এমন এক সময় আসবে যে তুমি এক সৈন্যদলে থাকবে আর আলী অপর সৈন্যদলে থাকবে, আর আলী সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে আর তুমি ভ্রান্তিতে থাকবে। একথা শুনে হযরত তালহার চোখ খুলে যায়; তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমার একথা মনে পড়েছে! তিনি তখনই বাহিনী থেকে বের হয়ে চলে যান। তিনি যখন রসূলে করীম (সা.)-এর কথা শুনে ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন এক হতভাগা যে হযরত আলীর বাহিনীর একজন সৈন্য ছিল, সে পেছন থেকে গিয়ে তাকে খঞ্জরাঘাতে তাকে শহীদ করে দেয়। হযরত আলী নিজের স্থানে বসে ছিলেন; হযরত তালহার হত্যাকারী এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে 'আমি অনেক বড় পুরস্কার পাব, দৌড়ে গিয়ে তাকে বলে, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনাকে আপনার শত্রুর নিহত হওয়ার সুসংবাদ দিচ্ছি! হযরত আলী জিজ্ঞেস করেন, কোন শত্রু? সে বলে, হে আমীরুল মুমিনীন, আমি তালহাকে হত্যা করেছি! হযরত আলী বলেন, হে হতভাগা আমিও তোমাকে রসূলে করীম (সা.)-এর পক্ষ থেকে সুসংবাদ দিচ্ছি যে তুমি দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে! কারণ একবার যখন আমি ও তালহা বসে ছিলাম, তখন রসূলে করীম (সা.) বলেছিলেন, হে তালহা, তুমি একবার সত্য ও ন্যায়ের স্বার্থে অপমান বরণ করে। তোমাকে এক ব্যক্তি হত্যা করবে, কিন্তু খোদা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

সিফফীনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, এর বৃত্তান্তে লেখা হয়েছে যে, এই যুদ্ধ হযরত আলী ও আমীর মুয়াবিয়ার মধ্যে ৩৭ হিজরী সনে সংঘটিত হয়েছিল। সিফফীন সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী একটি স্থান। হযরত আলী কুফা থেকে বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন। সিফফীন পৌঁছে দেখতে পান, সিরিয়ান বাহিনী আমীর মুয়াবিয়ার নেতৃত্বে আগেই সেখানে শিবির স্থাপন করে রেখেছে এবং তাদের একটি দল ফুরাত নদীর ঘাট দখল করে রেখেছিল। হযরত আলী

আশ্বস্ত করেন যে 'আমরা লড়তে আসি নি, বরং আমীর মুয়াবিয়ার সাথে বিবাদ নিষ্পত্তি করতে এসেছি; কিন্তু আমীর মুয়াবিয়া বিবাদ নিষ্পত্তি করতে সম্মত হন নি। সিরিয়ান বাহিনী হযরত আলীর বাহিনীকে ফুরাত নদী থেকে পানি নিতে বাধা দেয়, এতে হযরত আলী নিজ বাহিনীকে আক্রমণ করার নির্দেশ দেন। এভাবে হযরত আলী (রা.)'র বাহিনী সিরিয়ান বাহিনীকে পরাজিত করে নিজেদের জন্য ফুরাত নদী পর্যন্ত পথ তৈরি করে নিতে সক্ষম হয়। হযরত আলী সিরিয়ান বাহিনীকে ফুরাত নদী থেকে পানি নেয়ার ঢালাও অনুমতিও দান করেন। সিরিয়ানরা হযরত আলীকে নিষেধ করেছিল, পানি নিতে বাধা দিয়েছিল; কিন্তু তিনি যখন নদীর নিয়ন্ত্রন গ্রহণ করেন, তখন তাদেরকে পানি নিতে বাধা দেন নি, বরং অনুমতি দেন। আমীর মুয়াবিয়া গোঁ ধরেছিলেন যে, হযরত আলী যেন হযরত উসমানের হত্যাকারীদেরকে তার কাছে হস্তান্তর করেন। যখন লড়াই বেধে যাবার আশংকা সৃষ্টি হলে, তখন উভয় পক্ষের শান্তিপ্রিয় ব্যক্তিরা কোনমতে পরিস্থিতি শান্ত করেন। ৩৭ হিজরির সফর মাসে যুদ্ধের সূচনা হয়। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে (ছোটখাটো) সংঘর্ষ হতে থাকে, কিন্তু উভয় পক্ষ সর্বমুখী যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক পরিণতির কথা ভেবে যুদ্ধ এড়িয়ে যেতে থাকে। সন্ধি স্থাপনের সম্ভাব্য সকল সম্ভাবনা টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে উভয় পক্ষ এই বিষয়ে একমত হয় যে, সম্মানিত মাসগুলোতে সাময়িক যুদ্ধ-বিরতি দেয়া হোক; কিন্তু এই প্রচেষ্টাও সফল হয় নি। সফর মাসের শুরুতে পুনরায় যুদ্ধের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়ে দেয়া হয়। যখন যুদ্ধ কিছুদিন পর্যন্ত কোনরূপ চূড়ান্ত ফলাফল ছাড়াই চলতে থাকে, তখন আমীর মুয়াবিয়ার মনোবল ভেঙে পড়ে। সেই ভয়ংকর পরিস্থিতিতে হযরত আমর বিন আস আমীর মুয়াবিয়াকে বর্শার ফলায় ফলায় কুরআন শরীফ বেধে এই ঘোষণা করানোর পরামর্শ দেন যে, সিদ্ধান্ত এই গ্রন্থানুসারে হওয়া উচিত।

অতএব এমনটিই করা হয় যার ফলে হযরত আলী (রা.)-এর অনুসারীদের মাঝে মতবিরোধ দেখা দেয়। বৃহৎ সংখ্যক লোক বলে বসে, আল্লাহ্‌র কাছে সিদ্ধান্ত চাওয়ার সনির্বন্ধ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা যায় না। এভাবে হযরত আলী তাঁর অগ্রসারির সেনাদলকে ফিরে আসার নির্দেশ দেন আর যুদ্ধ থেমে যায়। হযরত আলী (রা.)-এর সেনাবাহিনীর অধিকাংশ লোক আমীর মুয়াবিয়ার এ প্রস্তাব মেনে নেয় যে, উভয় পক্ষ একজন করে হাকাম বা বিচারক নিযুক্ত করবে আর এই দুই বিচারক সমিলিতভাবে পবিত্র কুরআনের নির্দেশনা অনুসারে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হবে। ইতিহাস গ্রন্থে ঘটনাকে তাহকীম আখ্যা দেয়া হয়েছে। যাহোক, সিরিয়ানরা হযরত আমর বিন আস (রা.)কে মনোনীত করে এবং হযরত আলী (রা.) হযরত আবু মুসা আশআরীকে নিযুক্ত করেন আর চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করার পর সেনাবাহিনী অবস্থানস্থলে চলে যায়। এটি ইবনে আসীর-এর ইতিহাসগ্রন্থের উদ্ধৃতি। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এসম্পর্কে লিখেছেন যে,

এ যুদ্ধে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সঙ্গীরা চতুরতা অবলম্বন করে বর্শার মাথায় পবিত্র কুরআন উঠিয়ে ধরে বলে, পবিত্র কুরআন যে সিদ্ধান্ত দিবে তা আমরা মেনে নিব আর এ উদ্দেশ্যে হাকাম বা বিচারক নিযুক্ত করতে হবে। একথা শুনে সেই নৈরাজ্যবাদীরাই যারা হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যা ষড়যন্ত্রে সম্পৃক্ত ছিল আর যারা তাঁর শাহাদাতের পর পরই নিজেদের প্রাণ রক্ষার জন্য হযরত আলী (রা.)-এর দলে যোগ দেয় আর তারাই হযরত আলী (রা.)-এর ওপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকে এবং বলে, তারা সঠিক কথা বলছেন। আপনি সিদ্ধান্তের জন্য হাকাম বা বিচারক নিযুক্ত করেন। হযরত আলী (রা.) অনেকবার অস্বীকৃতি জানান কিন্তু তারা এবং কিছু সংখ্যক দুর্বল স্বভাবের মানুষ যারা তাদের ফাঁদে পড়ে যায়, তারা হযরত আলী (রা.) কে হাকাম বা বিচারক নিযুক্ত করার বিষয়ে বাধ্য করে। অতএব মুয়াবিয়ার পক্ষ থেকে হযরত আমর বিনুল আস (রা.) এবং হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষ থেকে হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.) হাকাম বা বিচারক নিযুক্ত হন। এই তাহকীম আসলে হযরত

উসমান (রা.) হত্যার প্রেক্ষাপটে গঠিত হয়েছিল আর শর্ত ছিল, পবিত্র কুরআন অনুসারে সিদ্ধান্ত হবে। অর্থাৎ হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যার বিষয়ে সিদ্ধান্ত করার জন্য হাকাম বা বিচারক নিযুক্ত করা হয়েছিল। খুনি যে-ই হোক পবিত্র কুরআন অনুসারে তাদেরকে পাকড়াও শাস্তির আওতায় আনার বিষয়ে সিদ্ধন্ত হবে। কিন্তু আমর বিনুল আস (রা.) এবং আবু মুসা আশআরী (রা.) উভয়ে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত করেন, ভালো হয় যদি প্রথমে আমরা এ দু'জনকে অর্থাৎ হযরত আলী (রা.) ও হযরত মুয়াবিয়া (রা.) কে তাদের ইমারত থেকে অপসারণ করি। তাহকীম গঠিত হয় বা হাকাম নিযুক্ত হয় হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য। কিন্তু এখানে যে দু'জন হাকাম নিযুক্ত হয়েছিলেন তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, প্রথমে দু'জনকে পদ থেকে অপসারণ করতে হবে, এরপর অন্য কথা হবে। কেননা এ দু'জনের কারণেই সকল মুসলমান সমস্যাকবলিত; এটি ছিল তাদের দু'জনের মনোভাব। এরপর মুসলমানদের স্বাধীনভাবে কোন সিদ্ধান্তের সুযোগ দিতে হবে যেন তারা যাকে চায় তাকে খলীফা বানাতে পারে। অথচ তারা একাজের জন্য নিযুক্তই হন নি। এ দু'জন হাকাম বা বিচারক যেভাবে চিন্তাভাবনা করেছিল সেটি ছিল ভ্রান্ত কেননা তারা এ কাজের জন্য নিযুক্তই ছিলেন না। যাহোক এ দু'জন এই সিদ্ধান্তের ঘোষণা দেয়ার জন্য একটি সাধারণ জনসভার আয়োজন করেন। এতে হযরত আমার বিনুল আস (রা.) হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.) কে বলেন, প্রথমে আপনি আপনার সিদ্ধান্তের ঘোষণা দিন এরপর আমি ঘোষণা দিব। কথামত হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.) ঘোষণা দেন যে, তিনি হযরত আলী (রা.) কে খেলাফতের পদ থেকে অপসারণ করছেন। এরপর হযরত আমর বিনুল আস (রা.) দাঁড়িয়ে বলেন, হযরত আবু মুসা (রা.) হযরত আলী (রা.) কে পদচ্যুত করেছেন আর তার এ কথার সাথে আমিও ঐকমত্য পোষণ করছি এবং হযরত আলী (রা.) কে খেলাফত থেকে পদচ্যুত করছি, কিন্তু মুয়াবিয়াকে আমি ক্ষমতাচ্যুত করছি না, বরং তার ইমারতের পদে তাকে বহাল রাখছি। হযরত আমর বিনুল আস (রা.) ব্যক্তি হিসেবে অনেক পুণ্যবান মানুষ ছিলেন। কিন্তু হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, এখন আমি এ বিতর্কের লিপ্ত হচ্ছি না যে, এ সিদ্ধান্ত তিনি কেন নিয়েছিলেন? পুণ্যবান হওয়া সত্ত্বেও তখন তিনি কোনভাবে মানুষের কথায় প্ররোচিত হয়েছিলেন। কেন হয়েছিলেন তা ভিন্ন প্রসঙ্গ। তাই আমি এই বিতর্কে যাচ্ছি না; কিন্তু তার সিদ্ধান্ত ভুল ছিল। এই মীমাংসার পরে হযরত মুয়াবিয়ার সমর্থকেরা বলা শুরু করে, যারা বিচারক নিযুক্ত হয়েছিলেন তারা আলীর (রা.)-এর পরিবর্তে মুয়াবিয়ার পক্ষে রায় দিয়েছেন আর এটিই সঠিক সিদ্ধান্ত। কিন্তু হযরত আলী (রা.) এই মীমাংসা মানতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন, বিচারক এ উদ্দেশ্যে নিযুক্ত হয় নি আর তাদের এই মীমাংসাও কুরআনের কোন নির্দেশের অধীনে হয় নি। তখন হযরত আলী (রা.)-এর সেই মুনাফেকস্বভাব সমর্থকরাই যারা বিচারক নিযুক্তির বিষয়ে চাপ দিয়েছিল চিৎকার চেঁচামেচি করে বলতে থাকে, তাহলে বিচারক কেন নিযুক্ত করা হয়েছিল যখন কিনা ধর্মীয় বিষয়ে কোন বিচারক হতেই পারে না? হযরত আলী (রা.) উত্তরে বলেন, প্রথমত এ বিষয়টি চুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল যে, তাদের সিদ্ধান্ত কুরআনের বিধান অনুযায়ী হবে যার অনুসরণ তারা করেন নি। অর্থাৎ কুরআন অনুযায়ী মীমাংসা করা হয় নি। দ্বিতীয়ত বিচারক তো তোমাদের জোরাজুরির ফলে নিযুক্ত করা হয়েছিল। এখন তোমরাই বলছ, বিচারক কেন নিযুক্ত করলাম! তখন তারা বলে, আমরা তো আপনাকে কথার কথা বলেছিলাম আর আমরা আপনাকে যা কিছু বলেছিলাম তা আমাদের ভুল ছিল। কিন্তু প্রশ্ন হলো আপনি এ কথা কেন মেনে নিলেন? বিদ্রোহী ও মুনাফেকর বলে, এর অর্থ হলো আমরাও পাপী সাব্যস্ত হলাম আর সাথে আপনিও। উভয়েই সমদোষে দোষী হয়ে গেছি। আমরাও ভুল করেছি আর আপনিও করেছেন। এখন আমরা তো আমাদের পাপের জন্য তওবা করে নিয়েছি, কাজেই এখন আপনারও উচিত তওবা করে নেয়া এবং এটি মেনে নেয়া যে, আপনি যাকিছু

করেছেন তা অন্যায় ছিল। তাদের দুর্ভিসন্ধি এটি ছিল, হযরত আলী (রা.) যদি অস্বীকার করেন তাহলে তারা একথা বলে তাঁর বয়আত থেকে বেরিয়ে যাবে যে, যেহেতু তিনি ইসলাম বিরোধী কাজ করেছেন তাই আমরা তাঁর বয়আতভুক্ত থাকতে পারি না। আর তিনি যদি তাঁর অপরাধ স্বীকার করে নেন এবং বলেন, আমি তওবা করছি, তবুও তাঁর খেলাফত বাতিল হয়ে যাবে; কেননা যে ব্যক্তি এত বড় অপরাধ করে সে কীভাবে খলীফা হতে পারে? এসব কথা শোনার পর হযরত আলী (রা.) বলেন, আমি কোন ভুল করি নি। যে বিষয়ে আমি হাকাম বা বিচারক নিযুক্ত করেছিলাম তা ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী জায়েয বা বৈধ। এছাড়া বিচারক নিয়োগের সময় আমি স্পষ্টভাষায় এই শর্ত রেখেছিলাম যে, বিচারক যে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন তা যদি কুরআন ও হাদীস সম্মত হয় তবেই আমি তা অনুমোদন করব, অন্যথায় কোনক্রমেই আমি সেটির অনুমোদন দিব না। তারা যেহেতু এই শর্তের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন নি আর তাদের যে উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করা হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তও প্রদান করেন নি, কাজেই তাদের দেয়া সিদ্ধান্ত আমার জন্য কোন দলিল হতে পারে না। কিন্তু তারা হযরত আলী (রা.)-এর এই যুক্তি মেনে নেয় নি আর বয়আত থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং খারেজী নামে অভিহিত হয়। এরপর তারা এ মতবাদের উদ্ভব করে যে, আবশ্যিকভাবে আনুগত্যের যোগ্য বা অনুসরণীয় খলীফা কেউ নেই বরং সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের সিদ্ধান্ত অনুসারে কর্ম সম্পাদিত হবে। কেননা কোন এক ব্যক্তিকে আবশ্যিকভাবে এতায়াত যোগ্য আমীর মেনে নেয়া **"লা হুকমু ইল্লা লিল্লাহ্"** (অর্থাৎ আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কারো নির্দেশ চলবে না)-এর পরিপন্থি।

হিজরী ৩৮ সনে নাহ্রোয়ানের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। নাহ্রোয়ান বাগদাদ এবং ওয়াস্তার মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত। এ স্থানেই হযরত আলী (রা.) এবং খারেজীদের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইবনে আসীরের ইতিহাস গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, সিফফীনের যুদ্ধের সমঝোতার উদ্দেশ্যে হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষে হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.) এবং আমীর মু'আবিয়ার পক্ষে হযরত আমার বিনুল আস (রা.) বিচারক নিযুক্ত হন। ইসলামের ইতিহাসে ঘটনাকে তাহ্কীম বলা হয়। তাহকীম সম্পর্কে হযরত আলী (রা.)-এর সাথে তাঁর সেনাদলের একটি গোষ্ঠি দ্বিমত পোষণ করে আর বিদ্রোহ করে পৃথক হয়ে যায় আর খারেজী নামে অভিহিত হয়। খারেজীরা তাহ্কীমকে অন্যায় আখ্যা দিয়ে হযরত আলী (রা.) কে তওবা করার এবং খিলাফতের আসন ছেড়ে দেয়ার দাবি উত্থাপন করলে তিনি তা সরাসরি অস্বীকার করেন; কেন মেনে নেন নি তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আলী (রা.) আমীর মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে পুনরায় সিরিয়ার সেনাভিযানের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন, এমন সময় খারেজীরা বিদ্রোহী কর্মকাণ্ড আরম্ভ করে দেয়। তারা আব্দুল্লাহ্ বিন ওয়াহাবকে তাদের ইমাম বানায় এবং কুফা থেকে নাহ্রোয়ান অভিমুখে চলে যায়। খারেজীরা বসরাতেও তাদের দল সংঘবদ্ধ করে যা পরবর্তীতে নাহ্রোয়ান-এ আব্দুল্লাহ্ বিন ওয়াহাবের সৈন্যদলের সাথে গিয়ে যুক্ত হয়। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর একজন সাহাবী আব্দুল্লাহ্ বিন খাব্বাব (রা.)কে হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষ নেয়ার জন্য হত্যা করা হয় এবং তার গর্ভবতী স্ত্রীর পেট চিরে খুবই নির্মমভাবে তাকেও হত্যা করে আর তাঈ গোত্রের তিজনজ মহিলাকেও হত্যা করে। এ অবস্থার সংবাদ যখন হযরত আলীর কাছে পৌঁছায় তখন তিনি তদন্তের জন্য হারিস বিন মুর্রাকে প্রেরণ করেন। তিনি যখন তাদের কাছে প্রতিনিধি হিসেবে যান তখন খারেজীরা তাকেও হত্যা করে। এ অবস্থা দেখার পর হযরত আলী (রা.) সিরিয়া যাত্রার ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন এবং প্রায় ৬৫ হাজার সেনা সম্বলিত বাহিনী যা সিরিয়া অভিযানের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন তাদেরকে নিয়ে খারেজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হন। তিনি যখন নাহ্রোয়ানে পৌঁছান তখন খারেজীদের সন্ধির বার্তা প্রেরণ করেন এবং হযরত আবু আইয়্যুব আনসারী (রা.)কে পতাকা দিয়ে বলেন, এর নীচে যে আশ্রয় নিবে, তার সাথে যুদ্ধ করা হবে না। এ ঘোষণা শুনে সেসব খারেজী যাদের সংখ্যা ছিল ৪

হাজার ছিল তাদের মধ্যে ১০০ জন হযরত আলী (রা.)-এর সাথে যুক্ত হয়ে যায় এবং একটি বড় সংখ্যার লোক কুফায় ফিরে যায়। শুধু ১ হাজার ৮০০ লোক আব্দুল্লাহ্ বিন ওয়াহাব খারেজীর নেতৃত্বে সম্মুখে অগ্রসর হয় এবং হযরত আলী (রা.)-এর ৬৫ হাজার সেনার সাথে যুদ্ধ হয় যাতে সব খারেজী নিহত হয়। একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী খারেজীদের সামান্য একটি অংশ বেঁচে যায় যাদের সংখ্যা ছিল ১০ জনেরও কম। হযরত আলী (রা.)-এর সেনাবাহিনীর ৭ ব্যক্তি শহীদ হন।

হযরত আমরা বিনতে আব্দুর রহমান (রা.) বর্ণণা করেন, হযরত আলী (রা.) যখন বসরা অভিমুখে যাত্রা করেন তখন শেষ সাক্ষাতের জন্য তিনি মহানবী (সা.)-এর পবিত্র স্ত্রী হযরত উম্মে সালেমা (রা.)-এর নিকট আসেন। তখন তিনি হযরত আলী (রা.)কে বলেন, আপনি আল্লাহ্ তা'লার সুরক্ষা ও নিরাপত্তার ছায়ায় যাত্রা করুন। খোদার কসম! নিশ্চয় আপনি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং সত্য আপনার সাথে আছে। রসূলুল্লাহ্ (স.) আমাদেরকে গৃহে অবস্থানের নির্দেশ দিয়েছেন। যদি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (রা.)-এর অবাধ্যতার ভয় না থাকত তবে আমি আপনার সাথে যেতাম। কিন্তু খোদার কসম! এরপরও আমি আমার পুত্র ওমরকে আপনার সাথে প্রেরণ করছি, সে আমার দৃষ্টিতে সর্বোৎকৃষ্ট এবং আমার প্রাণাধিক প্রিয়। যাহোক, এই স্মৃতিচারণ চলছে আর ভবিষ্যতেও অর্থাৎ আগামী সপ্তাহেও অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ্।

আজও আমি পাকিস্তান এবং আলজেরিয়ার আহমদীদের জন্য দোয়ার অনুরোধ করতে চাই। আলজেরিয়ার সম্পর্কে অবশ্য ভাল সংবাদ রয়েছে আর তা হলো বিগত দু'তিন দিনে দু'টি ভিন্নভিন্ন আদালত মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত অভিযুক্ত অনেক আহমদীকে মুক্ত করে দিয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা এই ন্যায়পরায়ন জজদের পুরস্কৃত করুন। আল্লাহ্ তা'লা ব্যবস্থাপনার অন্যান্যদেরকে ও বিচার বিভাগকে সুবিচার করার সামর্থ দান করুন কেননা আহমদীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হচ্ছে।

পাকিস্তানের কিছু কর্মকর্তা এবং বিচারক যারা ন্যায়নীতি বিসর্জন দিচ্ছে আর নিজেদের ক্ষমতার অপব্যাবহার করছে; আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও তাদের হৃদয়ের হিংসা বিদ্বেষ হতে মুক্ত হয়ে বিষয় দেখার তৌফী দিন। আল্লাহ্ তা'লার সন্নিধানে যাদের সংশোধন হবার নয় আল্লাহ্ তা'লা অচিরেই তাদের শাস্তির উপকরণ সৃষ্টি করুন এবং আহমদীদের জন্য পাকিস্তানেও শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করুন। পাকিস্তানে অবস্থানরত আহমদীরা বিশেষভাবে বেশি বেশি নফল আদায় ও দোয়ার প্রতি জোর দিন। এসব দোয়ার মাঝে রয়েছে, **রাব্বি কুল্লু শাইয়িন খাদিমুকা রাব্বি ফাহ্ফাযনী ওয়ানসুরনী ওয়ার হামনী**–এ দোয়া অধিকহারে পাঠ করুন। **'আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফী নুহূরিহিম, ওয়া নাঊযুবিকা মিন শুরূরিহিম'** দোয়াটিও অনেক বেশি পাঠ করুন। ইস্তেগফার করার প্রতিও মনোযোগ নিবদ্ধ করুন। দরূদ শরীফ পাঠের প্রতিও মনোযোগী হোন; আজকাল এর প্রয়োজন অনেক বেশি। আমি যেমনটি বলেছি, নফল ইত্যাদিও পড়ুন। আল্লাহ্ তাদের তৌফিক দিন আর দ্রুত সেখানকার অবস্থাও অনুকূল করুন।

আজও আমি নামাযের পর কয়েক জনের গায়েবানা জানাযা পড়াব। যাদের মাঝে প্রথম জানাযা হবে মোকাররমা হুমদা আব্বাস সাহেবার যিনি খায়েরপুর নিবাসী শহীদ মোকাররম আব্বাস বিন আব্দুল ক্বাদের সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। গত ২৯ ডিসেম্বর তারিখে ৯১ বছর বয়সে ঐশী নিয়তি অনুযায়ী তিনি মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার পিতা ডাক্তার মুহাম্মদ ইব্রাহীম সাহেব কিং এডওয়ার্ড মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নকালে ১৯২৬ সনে নিজের আহমদী সহপাঠীর মাধ্যমে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজ স্ত্রীসহ হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর হাতে বয়আত করে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৫১ সনের মে মাসে লাহোরে তার অর্থাৎ হুমদা সাহেবার বিয়ে হয়েছিল প্রফেসর আব্বাস বিন আব্দুল ক্বাদের সাহেবের সাথে, যিনি

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত মওলানা আব্দুল মাজেদ সাহেবের পৌত্র ছিলেন এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর স্ত্রী হযরত সৈয়্যদা সারাহ্ বেগম সাহেবার বড় ভাই প্রফেসর আব্দুল ক্বাদের সাহেবের পুত্র ছিলেন। ১৯৭৪ সনে তার স্বামী প্রফেসর আব্দুল ক্বাদের সাহেবকে খায়েরপুরে শহীদ করা হয়েছিল। তিনি পরম ধৈর্য ধারণ করেন, কোন প্রকার অধৈর্য প্রদর্শন করেন নি এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকেন। তার স্বামীর শাহাদত হলে তার অ-আহমদী খালাতো ভাই সমবেদনা জ্ঞাপনসূচক পত্রে লিখেন যে, আব্বাস অনেক ভালো মানুষ ছিলেন, হায় তার মৃত্যুও যদি সঠিক পথে হতো! এতে হুমদা সাহেবা তাকে উত্তরে লিখেন যে, আমি গর্বিত, কেননা যে পথে আমার স্বামী প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন তা সঠিক পথ।

হুমদা সাহেবারই স্কুল জীবনের একজন ঘনিষ্ঠ বান্ধবী ছিলেন, শফীকা সাহেবা, ঘটনাচক্রে যার সাথে পরবর্তীতে পাকিস্তানের জেনারেল জিয়াউল হক-এর বিয়ে হয়। একবার তার স্বামীর প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর তিনি অর্থাৎ জিয়াউল হক সাহেবের স্ত্রী বলেন যে, সবাই আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে কিন্তু হুমদা (সাক্ষাতের জন্য) আসে না। একথা জানতে পারলে হুমদা সাহেবা বলেন, এমন এক ব্যক্তির স্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের আমার কোন ইচ্ছা নেই যে কিনা আমার প্রিয় ইমাম হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং তাঁর জামা'তের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে। আর এরপর তিনি তার সাথে কখনো সাক্ষাৎ করেন নি। মরহুমা বহু গুণের আধার ছিলেন। খুবই পরিচ্ছন্নতাপ্রিয় ছিলেন। উন্নত শিষ্টাচারের অধিকারিণী, খুবই পুণ্যবতী ও নিষ্ঠাবতী নারী ছিলেন। সর্বদা নামায ও রোযা খুবই আগ্রহের সাথে পালন করতেন। সন্তানদের মাঝেও এই অভ্যাস সৃষ্টি করেছেন। চাঁদা প্রদানের ক্ষেত্রে খুবই তৎপর ছিলেন। দান-দাক্ষিণ্য করতে সদা প্রস্তুত থাকতেন। রমযান মাসে বহু লোকের জন্য নিজের ঘরে প্রতিদিন ইফতার করানোর ব্যবস্থা করতেন। খিলাফতের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক, প্রেম ও ভালোবাসা ছিল। নিয়মিত আমাকে নিজের হাতে চিঠি লিখতেন। অধিকাংশ সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাদি পাঠ করতেন এবং জামা'তের অন্যান্য পুস্তক ও আল-ফযল (পত্রিকা) জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত পাঠ করেছেন। ২০০৬ সনে তার ছোট মেয়ে ডাক্তার আমেরা সাহেবা সড়ক দুর্ঘটনায় দুই সন্তানসহ মৃত্যু বরণ করেন। এই শোকও তিনি খুবই সহসিকতার সাথে সহ্য করেছেন এবং ধৈর্যের এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছেন। সকল বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিতরা তার অগণিত গুণের কারণে তাকে ভালোবাসতেন। অ-আহমদী আত্মীয়দেরও তার সাথে খুবই ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিন কন্যা এবং দুই পুত্র রয়েছেন যারা আমেরিকা, কানাডা এবং নরওয়েতে বসবাস করছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে, অর্থাৎ তার সন্তানদের এবং তাদের সন্তানদের তার পুণ্যকর্মসমূহ ধরে রাখার তৌফিক দিন এবং মরহুমার মর্যাদা উন্নীত করুন।

পরবর্তী জানাযা ইরাকের অধিবাসী রিজওয়ান সৈয়্যদ নাঈমী সাহেবের, যিনি গত ১৩ নভেম্বর তারিখে ৭০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার পুত্র মুস্তফা নাঈমী সাহেব লিখেন, আমার পিতা স্বপ্নে নিজেকে হযরত সৈয়্যদ আব্দুল ক্বাদের জিলানী সাহেবের কাছে দেখতে পান, যিনি আমার পিতাকে তার জুতা প্রদান করেন। আমার পিতা এই বলে তা নিতে দ্বিধা বোধ করেন যে, আমার কী যোগ্যতা আছে, আমি সৈয়্যদ আব্দুল ক্বাদের জিলানী-র জুতা পরিধান করতে পারি। কিন্তু সৈয়্যদ আব্দুল ক্বাদের জিলানী সাহেব জোর দিলে আমার পিতা জুতা পরে নেন। অতঃপর সৈয়্যদ আব্দুল ক্বাদের জিলানী (রহ.) এক ব্যক্তি ও তার জামা'তের প্রতি ইঙ্গিত করে আমার পিতাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। এরপর রেজওয়ান আমিনী সাহেব স্বপ্নে মহানবী (সা.)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেন। কয়েক বছর পর এম.টি.এ.-এর মাধ্যমে জামা'তের সাথে তার পরিচয় ঘটলে রেজওয়ান সাহেব

বলেন, তিনি যে স্বপ্নে মহানবী (সা.)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন– এর অর্থ তাঁর (সা.) নিষ্ঠাবান দাস হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমন ছিল। আর দ্বিতীয় স্বপ্নে যে ব্যক্তি এবং যার জামা'তের প্রতি ইশারা করে শেখ আব্দুল কাদের জিলানী সাহেব তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে বলেছিলেন– এর অর্থ খলীফাতুল মসীহ্ ও তার জামা'ত ছিল। সুতরাং তিনি ২০১২ সালে বয়আত করেন। মরহুম অত্যন্ত পুণ্যবান, সৎ এবং নিজ আত্মীয় স্বজন ও দরিদ্রদের সাহায্যকারী ছিলেন। তবলীগের গভীর আগ্রহ ছিল। দুর্বল স্বাস্থ্য এবং মানুষের বিরোধিতা সত্ত্বেও নিজ এলাকায় আহমদীয়াতের তবলীগ করতে থাকেন। নিজ বংশের সদস্যদের সর্বদা নসীহত করতে থাকতেন যেন তারা বয়আত করে (আহমদীয়া) জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হয়। তার পুত্র, সহধর্মিণী এবং সহধর্মিণীর ভাইও এখন বয়আত করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে অবিচলতা দান করুন এবং মরহুমের পূণ্যকর্মসমূহ চলমান রাখার তৌফিক দিন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের মর্যাদা উন্নীত করুন।

পরবর্তী জানাযা সারগোধা জেলার মুকাররম মালেক আলী মুহাম্মদ হাজকা সাহেবের, যিনি কেনিয়ার মুরব্বী সিলসিলাহ্ মুহাম্মদ আফজাল জাফর সাহেবের পিতা ছিলেন। তিনি গত ২০ আগস্ট তারিখে ৯০ বছর বয়সে ঐশী বিধান অনুযায়ী মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। ১৯৭৪ সালে তিনি আল্লাহ্‌র পথে কারাবরণের সৌভাগ্যও লাভ করেছিলেন। জামা'তের কর্মকর্তা-কর্মচারী, ওয়াকফে জিন্দেগী মুরব্বী ও মুয়াল্লেমদের তিনি অত্যন্ত সম্মান করতেন। মরহুম তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত; নামায ও রোযা পালনকারী, অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ ছিলেন। দরিদ্রদের দেখাশোনা করতেন, ধৈর্য্যশীল ও কৃতজ্ঞ ছিলেন। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করতেন। একজন পুণ্যবান ও নিষ্ঠাবান মানুষ ছিলেন। নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তিনি অনেক শিশুকে কুরআন পড়ানোর সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তার উত্তরসূরীদের মাঝে তিন পুত্র ও এগারোজন পৌত্র-পৌত্রী অন্তর্ভুক্ত। তার এক পুত্র, আমি যেমনটি বলেছি, কেনিয়ার মুরব্বী সিলসিলা মুকাররম মুহাম্মদ আফজাল জাফর সাহেব কেনিয়ায় (কর্মক্ষেত্রে) থাকার দরুন পিতার জানাযা ও দাফনে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। আল্লাহ্ তা'লা তাকে ধৈর্য ও সাহস দান করুন। মরহুমের সাথে তিনি ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন, তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

পরবর্তী জানাযা হলো লাহোরের শাফকাত মাহমুদ সাহেবের পুত্র ইহসান আহমদ সাহেবের। গত ২৭ জুলাই তারিখে ৩৫ বছর বয়সে করোনা ভাইরাসের কারণে তার মৃত্যু হয়, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি গুজরাত জেলার গোলেকী নিবাসী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর সাহাবী হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন আজমল সাহেবের পৌত্র ছিলেন আর গুজরানওয়ালা নিবাসী ইরশাদ আহমদ সাহেবের দৌহিত্র ছিলেন। বিগত দু'বছর তিনি লাহোরের রচনা টাউন হালকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে সেবা করার তৌফিক লাভ করেন। এছাড়া তিনি দিল্লী গেট এমারতে সেক্রেটারী নওমোবাঈন হিসেবে সেবা করার তৌফিক পেয়েছেন। তবলীগের গভীর আগ্রহ ছিল এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি আটজনকে বয়আত করানোরও সৌভাগ্য লাভ করেছেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী ছাড়াও দু'পুত্র স্নেহের হান্নান আহমদ মসরূর, বয়স ছয় বছর এবং স্নেহের মুবীন আহমদ তাহের, বয়স তিন বছর এবং এক কন্যা স্নেহের সায়েরা আহমদ, বয়স পাঁচ বছর, পিতা, মাতা, তিন ভাই ও দু'বোন রয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে ধৈর্য ও দৃঢ়মনোবল দান করুন। তিনি স্বয়ং এই সন্তানদের অভিভাবক হোন আর তাদেরকে প্রয়াতের সৎকাজগুলো ধরে রাখার তৌফিক দান করুন এবং প্রয়াতের মর্যাদা উন্নীত করুন।

পরবর্তী জানাযা হলো মওলানা জালাল উদ্দীন শামস সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র জনাব রিয়াজ উদ্দীন শামস সাহেবের। (তিনি) গত ২৭ মে তারিখে ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

প্রয়াতের বংশ পরিচয় হলো, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত মিয়া মুহাম্মদ সিদ্দীক সাহেবের প্রপৌত্র, হযরত মিয়া ইমাম উদ্দীন সিখওয়ানী সাহেবের পৌত্র, হযরত খাজা ওবায়দুল্লাহ্ সাহেবের দৌহিত্র এবং হযরত মওলানা জালাল উদ্দীন শামস সাহেবের পুত্র ছিলেন। তাঁরা সবাই সাহাবী ছিলেন। মরহুম ওসীয়্যতকারী ছিলেন। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে দু'কন্যা এবং এক পুত্র রয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সন্তানদেরকে ধৈর্য ও দৃঢ়মনোবল দান করুন। তার স্ত্রী পূর্বেই ইন্তেকাল করেছেন। মরহুমের প্রতি তিনি ক্ষমা ও দয়াসূলভ আচরণ করুন এবং (তার) পদমর্যাদা উন্নীত করুন। প্রয়াতের ভাই মুনীর উদ্দীন শামস সাহেব বলেন, মরহুম বহু গুণের আধার ছিলেন, নিয়মিত নামায পড়তেন, সন্তানদের সর্বদা নামাযের জন্য অনুপ্রাণিত করতেন। খিলাফতের প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা ছিল। বাড়িতে সর্বদা খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার বিষয়ে আলোচনা হতো। অসুস্থাবস্থায়ও দু'বছর পূর্বে এখানে আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য আসেন আর রোগাক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও পরম ধৈর্য ও দৃঢ়মনোবল নিয়ে সানন্দে কথা বলতে থাকেন। কোন চিন্তা থাকলে তা ছিল সন্তানদের ঘিরে, নিজের জন্য কোন চিন্তা ছিল না। তার সম্পর্কে সবার অভিমত হলো, সর্বদা সকল অবস্থায় হাসতে থাকা আর সবার সাথে মিলেমিশে থাকা এবং সুখ-দুঃখে মানুষের পাশে দাঁড়ানো ছিল তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি ক্ষমা ও দয়াসূলভ আচরণ করুন আর (তার) মর্যাদা উন্নীত করুন। (আমীন)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)